International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-I, January 2026, Page No. 43-53
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.01W.179

উত্তর ত্রিপুরার সমকালীন বাংলা কবিতার ধারা: কবিত্ব, চেতনা ও কাব্য-নন্দনশাস্ত্রের বিশ্লেষণ

রাজু নাথ
বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত

Received: 22.12.2025; Accepted: 05.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The contemporary Bengali poetry of North Tripura is marked by reflections on life and death, existential consciousness, poverty and deprivation, socio-political protest, pandemic experiences, and the intense struggle of human survival. Its simplicity of language combined with experimental forms – broken typography, prose-poetry, and innovative metaphors – gives these poems a distinct voice. Women's perspectives, environmental awareness, memory, and emotional conflict also emerge as important elements. Despite being rooted in local realities, the poets evoke a universal humanism, turning every poem into a lyrical expression of the time, society, and the profound crises faced by people.

Keywords: Contemporary Bengali Poetry, Existential Consciousness, Socio-political Protest, Pandemic Experience, Human Struggle and Survival

উত্তর ত্রিপুরার সমকালীন বাংলা কবিতা একটি স্বতন্ত্র কাব্যধারা— যেখানে ছোট পরিসরের ভৌগোলিক বাস্তবতা সত্ত্বেও ভাষা, চিন্তা, চেতনা ও কাব্য-নন্দনের পরিধি অত্যন্ত বহুমাত্রিক। এই অঞ্চলের কবিরা একদিকে যেমন ব্যক্তিজীবনের গভীর অনুভূতি, প্রেম, ক্ষোভ, প্রবাসবোধ ও মৃত্যুচেতনা কবিতায় প্রকাশ করেছেন, তেমনি অন্যদিকে সমাজ-রাষ্ট্র-রাজনীতি, পুঁজিবাদ, শ্রম, দারিদ্র্য, করোনাকাল, মানবতার সংকট, বাক স্বাধীনতার ক্ষয়, নাগরিক যন্ত্রণা প্রভৃতি বিষয়ও তাঁদের কবিতায় তীব্র প্রতীকী ও বাস্তব উভয় আঙ্গিকেই প্রতিফলিত হয়েছে। সেলিম মুস্তাফা, সন্তোষ রায়, পীযুষ রাউত, তমাল শেখর দে, অভিজিৎ চক্রবর্তী, নিবারণ নাথের মতো কবিরা একদিকে শব্দ-নির্মাণে নতুন ভাষাবোধ গড়ে তুলেছেন; অন্যদিকে সমাজের অমানবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে কাব্যের রূপে অর্থবহ করে তুলেছেন।

এঁদের সঙ্গে পরবর্তী দশকের কবিরা— চিরশ্রী দেবনাথ, লিটন শব্দকর, প্রমুখ— নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নগর-গ্রামের দ্বন্দ্ব, স্বপ্ন-অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা, ভাষার নতুন বিন্যাস, ব্যক্তিজীবনের অনিশ্চয়তা ও সমাজবোধকে আধুনিক ব্যঞ্জনায় রূপ দিয়েছেন।

ফলে উত্তর ত্রিপুরার সমকালীন কবিতায় দেখা যায়— কবি সত্তার অভ্যন্তরীণ জাগরণ, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, নন্দনচেতনার নতুন নির্মাণ এবং ভাষার অন্তর্লীন সুরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নতুন কবিতা-ধারার উন্মেষ।

কবিতাকে নতুন হতে গেলে ক্রমাগত পরিবর্তনের মুখে নিয়ে যেতে হয়, ক্রমাগত সময়ের উন্মোচনই কবি। সমগ্রতা বোধ কবিতাকে কালোত্তীর্ণ করে তোলে। তার মধ্যে নবীনের মায়া যেমন থাকে, তেমনি পুরানোর

ভাঙচুর, বর্তমানে আধুনিক কালে কবিদের কাব্যচর্চা উন্নতর রূপলাভ করেছে। দিনে দিনে তাঁদের প্রতিভার বিকাশ বেড়েই চলেছে।

ক্ষুদ্র ভৌগোলিক সীমানা— কিন্তু বিশাল কাব্য–আবেদনে পরিপূর্ণ উত্তর ত্রিপুরার সমকালীন বাংলা কবিতায় যে অল্পসংখ্যক কবি তাঁদের সৃজন–দীপ্তিতে আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করেছেন, সেলিম মুস্তাফা তাঁদের অন্যতম। ১৯৬৩ সালে অধুনা বাংলাদেশের সিলেট জেলার হবিগঞ্জের ভাদেশ্বর গ্রামে জন্মালেও তিনি স্থায়ীভাবে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরকে তাঁর সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল করে তুলেছেন। পীযুষ দাস বিশ্বাস— এই পিতৃপ্রদত্ত নামের আড়ালে তাঁর প্রকৃত পরিচয়— এক আদ্যন্ত কবিমনস্ক সত্তা, যিনি পেশাগত জীবনে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কে কর্তব্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেও তাঁর প্রকৃত পরিচয় স্ব-উজ্জ্বল কবিচরিত্রেই পরিপূর্ণতা পায়।

১৯৭৪ সালে প্রথম প্রকাশিত কবিতা থেকে শুরু করে একাধিক কবিতা–পত্রিকার সম্পাদনা পর্যন্ত তাঁর সাহিত্য–পথ এক নিরবচ্ছিন্ন কাব্য–নিবেদনের ইতিহাস। বর্তমানে তিনি 'পাখি সব করে রব' নামে একটি মাসিক কবিতা–পত্র সম্পাদনা করছেন— যা তাঁর সাহিত্যিক দায়বদ্ধতার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ।নদীর মতো অস্তিত্বের অন্তস্রোত 'বারবার পাল্টে যাই' (২০২৩) কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'নদীর মতো'— রচনাকাল ৬ মার্চ ২০২০— কবি এখানে জীবন ও মৃত্যুর আন্তঃসম্পর্ককে এক বহমান চেতনারূপে উপলব্ধি করেছেন। জীবন নদীর মতো অবিরত মৃত্যুর দিকে অগ্রসরমান— এই মৌল অস্তিত্ব–সত্যকে তিনি উচ্চারণ করলেও কবিতার সূচনালগ্নেই তিনি কেবল বহিরঙ্গ নয়, বরং সৃষ্টির অন্তঃস্থ তাড়নার দাবিকেই তুলে ধরেন—

"কিছু একটা লিখেছি আমি
কিছু একটি লিখেছি নদীর মতো।"[১]

এই উচ্চারণ কার্যসত্তার অন্তর্নিহিত তীব্রতা প্রকাশ করে— যা আদ্যসূত্রে একজন কবির অস্তিত্ব–উন্মুখ আকুতির প্রকাশ। তাঁর কবিসত্তা যেন জৈবিক অস্তিত্বকে অতিক্রম করে কেবল সৃষ্টির মধ্যেই পরিপূর্ণতা পায়।

কোরোনার দিন-১ ক্লান্তিহীন মানবচেতনার কাব্যে ২০২০ সালের ২৮ মার্চ রচিত 'কোরোনার দিন-১'— মহামারীর অমানবিক বাস্তবতার মধ্যে কবি জীবনের যাপন–দর্শনকে নতুন অর্থে প্রসারিত করেছেন। জীবনানন্দর "আমি পথ হাঁটিতেছি হাজার বছর ধরে"— এই ক্লান্ত জীবনের বিপরীতে সেলিম মুস্তাফা উচ্চারণ করেন এক অদম্য মানবচেতনা—

"আমরা হাঁটব হাঁটব,
থামব না কখনোই।"[২]

অতিমারির বহুবিধ নিষেধাজ্ঞা, মৃত্যুমুখী অস্তিত্ব, গৃহবন্দিত্ব— কিছুই তাঁর কাব্যচেতনার প্রাণশক্তিকে স্তব্ধ করতে পারে না। এই কবিতায় মানবজাতির সংকটকালে আত্ম–স্থিতির জেদ এবং বেঁচে থাকার নন্দনচেতনা এক সূক্ষ্ম দার্শনিক মাত্রা লাভ করেছে।

জগৎ–উপলব্ধির মিস্টিক সৌন্দর্য ৩১ মার্চ ২০২০ তারিখে রচিত 'অন্যকথা ভাবি' কবিতায় পৃথিবীর রূপ ও রহস্যকে কবি উপলব্ধির মিস্টিক অনুভবের মধ্য দিয়ে স্থাপন করেছেন—

"চমৎকার জায়গা এই পৃথিবী—
পাহাড় বৃক্ষ মাটি, নদীর কুলকুল ধ্বনি..."[৩]

এখানে কবির দৃষ্টি কেবল প্রকৃতির বাহ্যরূপে নিবদ্ধ নয়; বরং অস্তিত্বের গূঢ় বিস্ময়কে তিনি সহজ ভাষায় অনুধাবনযোগ্য করে তুলেছেন। এটি এক ধরনের নীরব তত্ত্ব–অনুসন্ধান—যেখানে মানুষ ও পৃথিবীর সম্পর্ক এক অতিরৈখিক সংযোগে রূপান্তরিত হয়।

গণতন্ত্রের অসারতা ও রাজনৈতিক ছদ্মবেশের উন্মোচন:

৪ এপ্রিল ২০২০ রচিত 'অন্যলোক' আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার দ্বিমুখিতা ও রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির অবলুপ্তিকে কবি অত্যন্ত সংযত কিন্তু তীক্ষ্ণ কাব্য–ছকে অনাবৃত করেছেন। ভোটের সময়কার কৃত্রিম ভদ্রতা ও মানবসেবার অভিনয়ের বিপরীতে সাধারণ মানুষের সারাংশে জমে ওঠা ক্ষোভকে তিনি রূপক বিশ্লেষণে প্রকাশ করেন—

"তার পেছনে যারা দল বেঁধে দাঁড়িয়েছিল
তারা পাড়ার ছেলেরা নয়—অন্যলোক।"[৪]

এই 'অন্যলোক' কেবল বাহ্যিক মানুষের রূপক নয়— এটি ক্ষমতার কুন্দলিত কাঠামোর প্রতীক। কবি নিজেও এখানে 'অন্যলোক' হয়ে ওঠেন— শোষিত, বঞ্চিত মানবসমষ্টির প্রতিনিধি হিসেবে।

রাষ্ট্রীয় অমানবিকতার বিরুদ্ধে দার্শনিক প্রতিবাদ ১২ মে ২০২০ রচিত 'কোরোনার দিন-৮'— এই কাব্যান্তরে কবি মহামারীতে রাষ্ট্র–সমাজের অমানবিকতা, শ্রমিক–নিধন, লাশের স্তুপ, রক্তাক্ত বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তীব্র ক্ষোভ এবং নৈতিক অবস্থান প্রকাশ করেন। নেতাদের মূর্খোচিত আত্মতুষ্টি— 'সব ঠিক হ্যায়'— এর বিরুদ্ধে তিনি ইতিহাসের কঠোর বিচারশক্তিকে আহ্বান করেন—

"লাশের ওপরে বীজধান পড়ে লাল হবে সব ধান—
কলের চাকার যন্ত্রণাটায় লেখা হবে লাল গান।"[৫]

এটি কেবল প্রতীকী প্রতিবাদ নয়—এ এক মার্কসীয় আর্থ–সামাজিক রূপকের শক্তিশালী প্রয়োগ—যেখানে রক্তাক্ত বাস্তবতার মধ্যেই ভবিষ্যৎ বিপ্লবের পূর্বাভাস নিহিত থাকে।

সেলিম মুস্তাফা উত্তর ত্রিপুরার সমকালীন বাংলা কবিতায় এক স্বতন্ত্র কণ্ঠ— যিনি তাঁর কাব্যের মাধ্যমে অস্তিত্বচেতনা, সামাজিক প্রতিবাদ, রাজনৈতিক দুঃশাসন, মহামারীর মানসিক অভিঘাত এবং মানবিক সৌন্দর্যবোধকে এক কঠোর কিন্তু কাব্যময় নির্মাণে রূপ দিয়েছেন। তাঁর 'বারবার পাল্টে যাই' কাব্যগ্রন্থ সমকালীন সময়–সচেতন কাব্যপ্রতিমার একটি শক্তিশালী দলিল।

ত্রিপুরার সমকালীন কাব্যভুবনে লিটন শব্দকর এক গুরুত্বপূর্ণ উদীয়মান নাম। ১৯৯৩ সালের ২০ অক্টোবর উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে জন্মগ্রহণকারী এই কবি পেশাগতভাবে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হলেও— তাঁর মূল মনোবৃত্তি নিবদ্ধ বাংলা সাহিত্য-জননীর অন্তর্লোকসাধনায়। শব্দকরের কাব্যজগৎ মূলত নগরজীবনের ছিন্ন বাস্তবতা, রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতির অবসান, দারিদ্র্য-দগ্ধ মানুষের কঠিন জীবনের রূঢ় রূপরেখা এবং অস্তিত্বের ক্ষয়িষ্ণুতা নিয়ে নির্মিত।

রাজনৈতিক ভাষার প্রতারণা ও জনমানসের অসহায়তা 'মঞ্চের বাষ্প' কবিতাটি ভারতীয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অন্তর্বিরোধকে প্রায় সমাজ-নৃবিজ্ঞানের বিশ্লেষণধর্মী কাব্যভাষায় উপস্থাপন করে। স্বাধীনতার আট দশক পরও দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অন্নসংকট, আশ্রয়হীনতা ও বেকারত্ব— এই পাঁচ সংকট ভারতীয় নাগরিকের দৈনন্দিন যন্ত্রণার স্থায়ী উপাদান হয়ে আছে। রাজনৈতিক মঞ্চে নেতাদের ফুলে ওঠা বাগাড়ম্বর নিছক ভাষিক তাপমাত্রা মাত্র; সময়ের সঙ্গে সেটি অডিটোরিয়াম পেরিয়ে চায়ের দোকানের ভাঁড়গ্লাসে ঠোক্করের ঠাণ্ডা বাস্তবে অবলুপ্ত হয়ে যায়।কবি তাই বলেন—

"মঞ্চের মিথ্যে আশ্বাস
অডিটোরিয়াম পেরিয়ে চায়ের দোকান..."[৬]

এখানে 'ভাঁড়', 'ঠোক্কর' ও 'চায়ের আঁচ'— এই তিনটি উপমা নাগরিক প্রতারিত চেতনার তীব্র বাস্তবদর্শনকে বহন করে। নির্বাচনের আগে জনতার আবেগ ফুলে ওঠা কেটলির জোয়ার—কিন্তু নির্বাচনোত্তর মুহূর্তেই সেই 'জোয়ার' সরে গিয়ে ফেলে রাখে 'পোড়া দাগে ফেনা'। কবি এভাবেই গণতন্ত্রের মায়ামৃগ-রূপকে উন্মোচন করেছেন।

জীবনের অসিদ্ধতার প্রতীকী মানস-নির্মাণ 'কুয়াশারা' কবিতায় শব্দকর মানবজীবনের অপ্রাপ্তির দীর্ঘ ছায়াকে কুয়াশার রূপকে ধরেছেন। প্রতিটি মানুষের স্বপ্ন—ধীর ধূসরতায় মিলিয়ে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে প্রতীক্ষার জীর্ণ পাতাগুচ্ছ। কবি লিখেছেন—

"স্বপ্ন অনেক,
অপেক্ষারা ম্লান হতে হতে জীর্ণ..."[৭]

এখানে 'অপেক্ষা' মূলত অস্তিত্বের ক্ষীয়মাণ শক্তির প্রতীক। জীবন মরুভূমির মতো ধু-ধু বিস্তৃত; প্রাপ্তি সেখানে কেবল মরীচিকার মতো। মৃত্যু-প্রভাতই কবির কাছে 'একটি শুদ্ধ দিন'—যা জীবনের অপূর্ণতার পরম সমাধি।

"ঘুমঘরে সকাল হাঁকে...
একটি শুদ্ধ দিন, নিকোনো।"[৮]

এই চিত্রকল্পে সময়, মৃত্যু ও মুক্তির গভীর ত্রিবেদী অনুভূতি প্রবিষ্ট।

শৈশবের নৈতিক স্বচ্ছতা বনাম আধুনিকতার অন্তঃসারশূন্যতা 'বানান' কবিতায় কবি শৈশবের নৈতিক সরলতা ও বর্তমান সময়ের জটিল, মূল্যবিচ্যুত সমাজবাস্তবতার মধ্যে একটি তীব্র বৈপরীত্য নির্মাণ করেছেন—

"সাদা-কালো বানানের ফাঁকে বাঁশির সরলতা..." [৯]

এখানে 'বাঁশির সরলতা' নিছক স্মৃতিমেদুরতা নয়; বরং মানবসভ্যতার কলুষমুক্ত প্রথম পাঠ, যা সময়ের সঙ্গে হারিয়ে গেছে।

সামাজিক পতনের নির্মম ঘোষণাপত্র এই কবিতায় শব্দকর সমকালীন সমাজের নৈতিক অবক্ষয়কে প্রায় ঘোষণাপত্রের কঠোরতায় চিহ্নিত করেন—

"সম্মান ছেলেখেলা, অসম্মান ট্র্যান্ড,
নগ্নতাই ব্র্যান্ড।"[১০]

সম্মান-অপমানের এই মূল্যবিনিময়-বিভ্রাট সমাজে নৈতিকতার শেষ অবশিষ্ট ভগ্নাংশকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে। কবি এখানে কেবল ক্ষোভ প্রকাশ করেননি; সমাজব্যাধির গভীর ক্লিনিক্যাল অভিসন্ধানও করেছেন।

উত্তর ত্রিপুরার সমকালীন বাংলা কবিতার পরিসর লিটন শব্দকরসহ একগুচ্ছ কবির সাহসী উচ্চারণে নতুন ভাষা, নতুন রূপক ও নতুন বাস্তবভূমির নির্মাতা হয়ে উঠেছে। এ অঞ্চলের কবিরা কেবল আঞ্চলিক অনুভবে আবদ্ধ নন; তাঁদের লেখনী সময়-রাজনীতি-সভ্যতা-অস্তিত্ব— সমস্ত জটিল মানসভূবনকে স্পর্শ করে বৃহত্তর বাংলা কবিতার জগতে এক তীক্ষ্ণ স্বতন্ত্র অবস্থান প্রতিষ্ঠা করেছে।

দার্শনিকতা, প্রতিবাদ, মানবিক আর্তি, নন্দনবোধ ও ভাষার পুনর্নির্মাণ— এই পাঁচ ভিত্তিস্তম্ভে ভর করেই উত্তর ত্রিপুরার কবিতা আজ নিজস্ব অনন্য পরিমণ্ডল নির্মাণ করছে। কবিগণ আজ শুধু শব্দের কারিগর নন; তাঁরা সমাজের নীরব, অদৃষ্ট ইতিহাস-লেখক— যাঁরা ক্ষয়িষ্ণু সময়ের গহ্বর থেকে ভবিষ্যতের আরেক সম্ভাব্য মানচিত্র আঁকছেন।

ত্রিপুরার সমকালীন বাংলা কবিতার পরিসরে সন্তোষ রায়ের আবির্ভাব এক বিশেষ শব্দতাত্ত্বিক অভিসার রচনা করেছে। ১৯৫১ সালে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর কাব্য–চেতনা মূলত উত্তর–পূর্বাঞ্চলের

ভূগোল, সামাজিক বাস্তবতা এবং উপনিবেশোত্তর মানস-দ্বন্দ্বে নিবিষ্ট। পেশায় শিক্ষক হলেও তাঁর সত্তার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল কবির অনিবার্য অন্তর্দাহ। সত্তর দশক থেকে সৃষ্টিশীলতার প্রবাহে তিনি যে ষোলোটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার মধ্যে 'রোদ পেরোলেই বাড়ি' বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

এই গ্রন্থের 'সংসার' কবিতা— সন্তোষ রায়ের রূপক-নির্ভর চিত্রপরিকল্পনার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, লয়-উদ্বেল, দহন-উল্লাস এবং প্রাত্যহিক অস্তিত্বের দ্বিবাচনিক টানাপোড়েনকে তিনি যে উপমা-উৎপ্রেক্ষায় প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা বাংলা আধুনিকতার পরবর্তী ধাপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।উদ্ধৃত চরণসমূহ—

> "আলনায় ফুটিতেছে ফুল
> পালঙ্কে ফলভার
> কুঁড়ি নড়িতেছে জানালায়"[১১]

এই ত্রিপদী রূপক-স্থাপত্য সংসারের জৈব-বিবর্তনের এক ধরনের প্রতীকি সার্বজনীনতা নির্মাণ করে। আলনায় ফোটা ফুল— গৃহস্থ জীবনের প্রাথমিক উদ্ভাস, সম্ভাবনার প্রথম বিচ্ছুরণ। পালঙ্কে ফলভার— প্রজনন ও পরিবারিক সম্প্রসারণের প্রতীক; সংসারের কেন্দ্রস্থলে জীবনের পরিপূর্ণতার ভৌত-অভিব্যক্তি।জানালার কুঁড়ি নড়া—নবজন্মের নড়াচড়া, অস্তিত্বের বিস্তার এবং ভবিষ্যৎ বাস্তবতার দিকে চাহনির ইঙ্গিত।এখানে রূপকচিত্র শুধুমাত্র দৃশ্যমান বস্তুর বর্ণনা নয়, বরং জীবনের অন্তর্নিহিত নন্দন-অন্তর্লোককে স্পর্শ করে। এক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য-উপলব্ধির সঙ্গে একটি অন্তঃসলিলা সংযোগ অনুভূত হয়। তাঁর চরণ—

> "চাদের আলোয় চাচর বালির চরা,
> এখানে কখনো বাসর যায় না গড়া"[১২]

উত্তরাধুনিক নগ্ন বাস্তবতার এক নির্নিমেষ নির্মাণ। সন্তোষ রায় সেই বাস্তবতাকে নিজস্ব ভঙ্গিতে পুনর্গঠিত করেছেন—

> "এহেন উদ্যানে কোনো প্রেমিক থাকেনা
> না কোনো মধুযামিনী পেরোয় চৌকাঠি"[১৩]

এখানে 'উদ্যান' শব্দটি আদর্শিক সৌন্দর্যের বয়ান হলেও তার প্রকৃত তাৎপর্য হলো বাস্তবতার নির্মম অনার্যতা। প্রেমিকের অনুপস্থিতি কিংবা মধুযামিনীর চৌকাঠ না পেরোনো— সমাজজীবনের রোমান্টিক সম্ভাবনার অপমৃত্যুকে নির্দেশ করে। কবি এইভাবে সংসারের দ্বৈত চরিত্র—জৈব স্নিগ্ধতা ও বাস্তব কঠোরতার— এক দ্বন্দ্বময় সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

সুতরাং, সন্তোষ রায়ের 'সংসার' কবিতা শুধু ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা নয়; বরং এটি উত্তর-পূর্ব ভারতীয় উপভাষিক আধুনিকতার মধ্য দিয়ে মানবজীবনের গভীর অস্তিত্ব-বয়ান, যার ব্যাখ্যা সুধীন্দ্রীয় বাস্তব-রূপকপ্রয়োগের সঙ্গে তুলনীয়।

উত্তর ত্রিপুরার কাব্য-ভূগোলে পীযুষ রাউত 'পণ্ডিত' এক উজ্জ্বল স্বর, যাঁর কবিতায় বিবরণধর্মীতা একটি কেন্দ্রীয় নন্দন-অঙ্গ। এই বর্ণনাশক্তি কেবল বিষয়বস্তুকে শনাক্ত করে না, বরং তাঁর কবিতায় একটি ইন্দ্রিয়-সম্পৃক্ত অন্তরঙ্গ সুর উৎপন্ন করে। উচ্চারণের স্বরঘাত, শব্দের মৃদু ভাঙন ও বিরতি— এসব মিলিয়ে তাঁর কবিতা পাঠক-মননে এক ধরনের অন্তশ্রুত অনুরণন সৃষ্টি করে, যা তাঁর কাব্য-বিশ্বের অনন্য বৈশিষ্ট্য।
শব্দ-নিরীক্ষা ও ধ্বনিতত্ত্ব রাউতের কবিতায় ধ্বনি, উচ্চারণ ও শব্দের স্বর-আবর্তন এক বিশেষ পরীক্ষামূলক প্রবণতা নির্দেশ করে। তিনি শব্দকে রবারের মতো প্রসারিত করে ধ্বনির বিস্তার ঘটান— অর্থাৎ শব্দের শারীরিক

দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে তার অন্তর্লীন অভিজ্ঞতাকে প্রসারমান করেন। এর ফলে কবিতার আঙ্গিক বিচ্ছেদ, লাইন-ব্রেক, দৃশ্যমান শব্দ-বিন্যাস নিজেই একটি শৈল্পিক গঠন হয়ে ওঠে।উদাহরণস্বরূপ—

এখানে ভাষা কেবল বর্ণনামাত্র নয়— এটি দৃশ্য, ধ্বনি, গতি ও মনস্তাত্ত্বিক চাপের সমষ্টি। 'ভেঙে যায় / ভেঙে যাচ্ছে / ভেঙে যাবে'— এই ক্রিয়াপদের কালানুক্রমিক রূপান্তর অন্তর্নিহিত অস্থিরতা প্রকাশ করে। পরবর্তী ভাঙা অক্ষর—

এ
ক
দি
ন

শব্দকে অক্ষরে ভেঙে তাকে সময়ের মতো খণ্ডিত করা— এ একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি, যা আধুনিক বাংলা কবিতায় বিরল নয় তবে রাউতের ক্ষেত্রে এটি ব্যক্তিগত স্বাক্ষররূপে চিহ্নিত। তারপরই—

"মধ্যরাত্রে শাসন করব
শহরের তামাম বড় বড় সড়ক।"[১৫]

এই ঘোষণামূলক বাক্য আত্মসত্তার আধিপত্য প্রকাশ করে— যেখানে 'আমি' এক প্রাত্যহিক শহুরে সন্ত্রস্ত বাস্তবতাকে শাসনের উচ্চারণে রূপান্তরিত করে।

পীযুষ রাউতকে চিররোমান্টিক কবি বলা হলেও তাঁর রোমান্টিকতা প্রচলিত রোমান্টিক বিদ্যালয়ের নয়। এটি গদ্যিক স্বচ্ছতায় আচ্ছাদিত ব্যক্তিগত রোমান্টিসিজম। তাঁর বাক্যগুলি সহজ, দীর্ঘ, কথোপকথনমুখী— যা অনেক সমালোচকের মতে গদ্যের বাক্যভঙ্গির সরাসরি প্রতিফলন। প্রচলিত ছন্দ, অলংকার, শাস্ত্রীয় গঠন তিনি প্রায়ই পরিহার করেছেন; এর ফলে তাঁর কবিতা অনেক সময় সংলাপ-ধর্মী হয়ে ওঠে। উদ্ধৃতি—

"হাসিমুখে সমগ্র গ্রীষ্ম তিনি দাঁড়িয়েছিলেন।
তাঁর নীল পোষাক,"[১৬]

এখানে ভাষার সরলতা সত্ত্বেও চিত্রকল্প তীব্র। 'সমগ্র গ্রীষ্ম দাঁড়িয়ে থাকা'— একটি ঋতুরূপী ব্যক্তিবাচক রূপক; আবার 'নীল পোশাক'— একটি প্রতীকী কোমলতা ও শীতলতার ইশারা। সরল বাক্য হলেও এতে আবহমান চিত্রময়তা ও নীরব রোমান্স মিশে আছে। ত্রিপুরার কাব্য-ইতিহাসে রাউতের স্থান ৮০-এর দশকে ত্রিপুরার কবিদের মধ্যে পীযুষ রাউতের স্বকীয়তা প্রধানত—

গদ্যবাক্য ব্যবহার ,বর্ণনাধর্মী রোমান্টিসিজম, শব্দকে ভেঙে-গড়ার দৃশ্য-কৌশল,কবিতার সংলাপধর্মীতা— এই চার বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

এভাবে পীযুষ রাউত বাংলা কবিতায় আধুনিক গদ্য-কবিতার এক স্বতন্ত্র রূপ নির্মাণ করেছেন, যেখানে শব্দ, বাক্য, শ্বাস, বিরতি ও দৃষ্টিপাত— সব মিলিয়ে একটি ভিন্নতর নন্দনতত্ত্ব রচিত হয়।

ত্রিপুরার সমকালীন বাংলা কবিতায় তমাল শেখর দে এক অনন্য ব্যঞ্জনাময় সত্তা, যিনি সাংবাদিকতার বাস্তব-মুখোমুখি অভিজ্ঞতাকে কবিতায় রূপান্তরিত করে সামাজিক প্রতিবাদ, ব্যথা, মূল্যবোধ-ক্ষয় ও মানবিক নিষ্পেষণের বহুরৈখিক বয়ান নির্মাণ করেছেন। ১৯৭৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ধর্মনগরে জন্মগ্রহণ করা এই কবি ত্রিপুরার কবিতায় এমন এক সময় আবির্ভূত হন, যখন সমাজ রাজনৈতিক সংকট, মতপ্রকাশের সঙ্কুচিত পরিধি ও রাষ্ট্রপরিকল্পিত নৈঃশব্দ্যের ভারে নীড়বদ্ধ।

তাঁর বহুল আলোচিত কাব্যগ্রন্থ 'আই কান্ট ব্রিদ'–এর প্রথম কবিতা 'আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না'— শুধু কবিতা নয়, এক প্রতীকী ঐতিহাসিক দলিল। নিঃশ্বাস— যা জীবনের মৌলতম জৈব প্রয়োজন, তা বন্ধ হয়ে আসার রূপক দিয়ে কবি আসলে রাষ্ট্রীয় দমন, মতপ্রকাশের সংকট, সামাজিক ফ্যাসিবাদ ও অবাধ্যতার ক্ষমতাহীনতা–কে ভাষায় সংহত করেছেন।

নিঃশ্বাস–রূপকের রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা উদ্ধৃত লাইন—

"আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।"[১৭]

এটি কেবল একটি শারীরিক অক্ষমতার প্রত্যয়ন নয়; এটি এক সামষ্টিক অস্তিত্ব–সংকটের আদর্শ রূপাঙ্কন। নিঃশ্বাস নিতে না পারা মানে— ব্যক্তিস্বাধীনতার চূর্ণবিচূর্ণতা,ক্ষমতার নিপীড়নে আত্মপরিচয়ের সংকোচ রাষ্ট্রীয় নৈঃশব্দ্য চাপিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া নাগরিকত্বের গৌরববোধের পতন এরই পরবর্তী লাইনগুলোতে কবি দেখান দমন–নীতি কতখানি মানসিক বিকলন ঘটায়—

"এখন আর আমি ইচ্ছে করলেই কাউকে
কুত্তার বাচ্চা গালি দিতে পারি না।"[১৮]

এখানে গালিগালাজের প্রসঙ্গ কোনো নীচতা নয়; এটি অবাধ স্বর–এর রূপক। অর্থাৎ মানুষ এমন এক নির্মম সময়ের মধ্যে আটকে গেছে, যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তিও অপরাধ।জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে তুল্যমাত্রিক ক্ষোভ–তত্ত্ব আপনি যথার্থই উল্লেখ করেছেন—১৯৪৬–৪৭-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জীবনানন্দ করেছিলেন—

"মানুষ মেরেছি আমি, তার রক্তে আমার শরীর ভরে গেছে।"[১৯]

এ লাইন আদতে নৈতিক দোষবোধ, মানবিক ভাঙন ও সমাজীয় উন্মত্ততার বিরুদ্ধে কবির গভীর ক্ষোভের পরিপক্ক বহিঃপ্রকাশ। তমাল শেখর দে তাঁর কবিতায় ঠিক সেই ক্ষোভকেই স্থানান্তরিত করেছেন সমকালীন বাস্তবতায়—

"যদি পারতাম, নিজের গায়েই প্রথম লাথিটা মারতাম।"[২০]

এখানে 'নিজের গায়ে লাথি মারার' অর্থ হলো মূল্যবোধ–হীনতার দায় নিজের ওপর নেওয়া এবং সামাজিক দুরবস্থায় আত্মঅবমাননাকে প্রতিবাদের এক নন্দনভাষায় রূপদান। এটি এক স্বসাক্ষ্যবাহী নিষ্ঠুর সত্য। রাষ্ট্রযন্ত্রের সমালোচনা: অত্যাচার ও নৈঃশব্দ্যের কবিতা কবি তাঁর মূল্যায়নে নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেন— রাষ্ট্র আজ ক্ষমতাকেন্দ্রীক স্বার্থগোষ্ঠীর হাতে বন্দী। বাক–স্বাধীনতার এই খণ্ডিত প্রতিধ্বনি ধরা পড়ে—

"সব বুঝেও চুপ করে থাকতে পারি।
বড় জোর তোমার সামনে পতাকা তুলে ধরে
দাঁড়িয়ে থাকতে পারি গাধার বাচ্চার মতো।"[২১]

এখানে 'গাধার বাচ্চা' শব্দবন্ধ শুধু তীব্র অবমাননার প্রকাশ নয়; এটি নাগরিকের বোধবুদ্ধিহীন, অসহায়, ব্যবহারযোগ্য অবস্থার এক দারুণ রূপক। কবির ভাষায় জাতির মানসিক দাসত্ব ফুটে উঠেছে। মৃত্যুর শীতল ছায়া ও অসহায়ের মিনতি কবিতার শেষাংশে আসে সাম্প্রতিক মহামারির ভয়াল দৃশ্য, যেখানে— হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে ছুটে বেড়ানো, মিথ্যে দেহের পতন, অক্সিজেনহীন মানবদেহে শ্বাসকষ্ট এসবই জীবনের মৃত্যুশাসিত বাস্তবতার ভীষণতা তুলে ধরে। কবি প্রধানমন্ত্রীর কাছেও আবেদন করেন— এ আবেদন রাজনৈতিক নয়, এটি মানবিক আর্তির আন্তর্জাতিক ভাষা। তমাল শেখর দে–র 'আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না' কবিতাটি— বাস্তবতার নির্মম ডকুমেন্টেশন রাষ্ট্র–সমাজ–রাজনীতির তীব্র সমালোচনা নাগরিক স্বাধীনতার সংকট মানসিক দমন ও ক্ষোভের নন্দনীয় রূপান্তর ইতিহাসের আতঙ্ক ও বর্তমানের রুপালি কষ্টের সংকলন সবকিছুকে মিলিয়ে একটি দর্শনমূলক, সমাজতাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক প্রতিবাদের শক্তিশালী কাব্যটেক্সট।

উত্তর ত্রিপুরার সমকালীন বাংলা কবিতায় অভিজিৎ চক্রবর্তী এক শক্তিমান কাব্য–সত্তা, যিনি ১৯৮৩ সালে জন্মগ্রহণ করে ত্রিপুরার কবিতার নতুন প্রজন্মে একটি দৃঢ়, স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তিনি যেমন কবি, তেমনি গবেষক; ফলে তাঁর রচনায় তথ্যনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি ও নান্দনিক মনোভঙ্গির এক অদ্বিতীয় সন্নিবেশ লক্ষ করা যায়। তাঁর আলোচিত কাব্যগ্রন্থ 'কাকজন্ম'— আধুনিক নাগরিক জীবনের অস্থিরতা, নৈতিক পতন, মানবিক সংকট ও মৃত্যুচেতনার বহুপার্শ্বিক নির্মাণ।

নাগরিক যন্ত্রণা ও সমাজ–অবক্ষয় : রূপক–রূপায়ন

'কাকজন্ম'–এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো— সমসাময়িক সমাজে মিথ্যা, ছদ্মবেশী, মেকি নৈতিকতার অধিকারী মানুষের উত্থান এবং প্রকৃত জ্ঞানীগুণীদের আত্মগোপন। কবি এটিকে কেবল নৈতিকতার সংকট হিসেবে দেখেন না; বরং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষবাষ্পের দ্বারা সৃষ্ট সমাজ–অবক্ষয়ের অনিবার্য লক্ষণ হিসেবেও চিহ্নিত করেন

এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত লাইন—

"কিছুই তো নেই, কেবল শরীর ছদ্মবেশ,
পর্দা সরে গেলে দেখি আরো দূর। রেশ কাটে না, অথচ জন্ম ফেটে যায়।"[২২]

এখানে 'শরীর ছদ্মবেশ'— শুধু ভণ্ডামির প্রসঙ্গ নয়; এটি এক অস্তিত্বগত মায়া, যেখানে মানুষ বাহ্যিক অবয়বে সজ্জিত হলেও অভ্যন্তরে শূন্য।'রেশ কাটে না'— যন্ত্রণার, বেদনার, নৈতিক ক্ষয়ের যে দীর্ঘসূত্রতা, তা ছিন্নহীন। 'জন্ম ফেটে যায়'—অস্তিত্বের বীজ ফাটে, কিন্তু অঙ্কুরোদ্গম নয়; বরং স্থায়ী ভগ্নতা।এভাবে কবি নাগরিক সময়ের দার্শনিক ক্ষয়–কে চিত্রায়িত করেছেন।কাক–রূপকের মৃত্যু–তত্ত্ব 'কাকজন্ম'–এর কেন্দ্রীয় প্রতীক কাক, যা বাংলা সাহিত্য–ঐতিহ্যে মৃত্যু, অশুভ, অস্থিরতা, ভবিতব্যতা ও ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতীক। অভিজিৎ চক্রবর্তী এই কাক–রূপককে পুনর্মূল্যায়ন করেছেন অস্তিত্ব–চেতনা ও মৃত্যুর অনিবার্যতার প্রসঙ্গে।উদ্ধৃতি—

"যতদূর যাও না কেন কাকজন্য পাবে
এসো এসো বসো কাক দেহের ছায়ায়।
তোমার শিসেতে দেহ মৃত্যু ফিরে পায়।"[২৩]

এখানে তিনটি স্তর লক্ষ্যণীয়—

১.মৃত্যুর সর্বত্রতা → যতদূরই পালাও, 'কাক' (অতএব মৃত্যু) অনিবার্যভাবে ধরা দেবে।
২.মৃত্যুর ছায়ায় আশ্রয় → 'দেহের ছায়ায়' বসা মানে—মৃত্যুকে জীবনের অঙ্গীভূত সত্য হিসেবে গ্রহণ।
৩.শিসে মৃত্যু ফিরে পাওয়া → মৃত্যু কেবল সমাপ্তি নয়; এটি সৃষ্টির নতুন প্রক্রিয়ারও সূচনা।

এভাবে কবি মৃত্যু–চেতনার এক চক্রাকার দর্শন নির্মাণ করেছেন।ব্যথার পরিশোধনশাস্ত্র অভিজিৎ চক্রবর্তী যন্ত্রণাকে কেবল সহনীয় অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখেন না; তিনি তাকে অস্তিত্বের পরিশোধনকারী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর কবিতায় ব্যথা হলো জ্বালা নয়, বরং নতুন শক্তির উৎস।উদ্ধৃত পংক্তি—

"আমার বেদনা পড়ে আছে একা ঘাসে
তুমি ঠোঁটে নাও, ঠোকরে ঠোকরে খাও
যদি পারো, তবে গাইব গান,
নাও ভাসাব আবার।"[২৪]

এখানে বেদনা— ঘাসে পড়ে থাকা— জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন'ঠোকরে খাওয়া'— বেদনার পুনরাবিষ্কার 'গান গাওয়া'—ব্যথার সৃজনাত্মক রূপ 'নাও ভাসাব'— ব্যথা অতিক্রম করে নতুন অভিযানে যাত্রা এই প্রক্রিয়াকে বলা যেতে পারে— ব্যথা থেকে সৃষ্টিতে উত্তরণের কবিতাশাস্ত্র।অভিজিৎ চক্রবর্তীর 'কাকজন্ম'— নাগরিক জীবন–

সংকটের বিশ্লেষণ ছদ্মবেশী সমাজচরিত্রের উন্মোচন মৃত্যুচেতনার রূপক–বিশ্লেষণ ব্যথার পরিশুদ্ধি ও অস্তিত্বগত মুক্তিত্রিপুরার আধুনিক কাব্য–মানসে নতুন দার্শনিক উত্তাপসব মিলিয়ে, এটি ত্রিপুরার কবিতায় একটি পরিণত, বোধ–সমৃদ্ধ, প্রতীকি এবং দার্শনিক কাব্যগ্রন্থ।

আধুনিক ত্রিপুরার কবিতায় চিরশ্রী দেবনাথ এক উজ্জ্বল উদীয়মান নক্ষত্র। ১৯৭৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্ম উত্তর ত্রিপুরার কৈলাশহরে। পিতা রাধাগোবিন্দ মজুমদার ছিলেন সংস্কৃতের অধ্যাপক এবং মাতা প্রয়াতা মায়ারানী মজুমদার—এই সাংস্কৃতিক পরিবেশই তাঁর কাব্যসত্তাকে শৈশব থেকেই উদ্বুদ্ধ করেছে।

২০২০ সালের বইমেলায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বিশ্বাসের কাছে নতজানু' সমকালীন সমাজ, সভ্যতার রূপান্তর, মানবজীবনের অন্তর্গত বেদনাবোধ ও প্রত্যাশাকে বহুমাত্রিকভাবে রূপ দিয়েছে।নগরায়ণের নির্মমতায় প্রথম কবিতা : 'প্রিয় দোয়েল পাখি'গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'প্রিয় দোয়েল পাখি'—এ কবি আধুনিকায়নের নামে নগরায়ণ ও পুঁজিবাদী আগ্রাসনের তীব্র সমালোচনা করেছেন। মানুষের ঘর-বাড়ি, চরিত্র, সম্পদ—সব কিছুই বাজারের দামে নিলামে তুলে দেওয়ার নির্মম প্রবণতাকে প্রতীকীভাবে তুলে ধরেছেন দোয়েল পাখির আশ্রয়চ্যুতি দিয়ে।

"কালই দেখেছি পাখিটিকে, দিনের শেষে কথা হয়েছিল
তাদের বাসা ও আজ নিলামে উঠেছে,
কিচির মিচির আর উড়ান নিয়ে চলে যেতে চাইছে আশ্বিনের গ্রহ।"[২৫]

এখানে পাখির বাসা মূলত প্রতীক মানুষের ঘরবাড়ির, নিরাপত্তার, অস্তিত্বের। সভ্যতার নামে যে ভাঙন, বাস্তুচ্যুতি, লোভী দখলদারিত্ব—কবি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রচনা করেছেন সুকোমল অথচ করুণ চিত্রভাষায়। স্থবির সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রূপের তীর গ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা 'যৌনতা নয়' আধুনিক সমাজের একঘেয়ে, ক্লান্ত, প্রাণহীন অবস্থাকে চিহ্নিত করে। মানুষ জন্মায়, বাঁচে, সম্পর্ক গড়ে—কিন্তু সমাজযন্ত্রের পুরনো, ধুলোমাখা ধাঁচে আটকে জীবন প্রায় অচল হয়ে পড়ে। কবি এই স্থবিরতার বিরুদ্ধে বিদ্রূপ ছুড়ে দিয়েছেন—

"যেন কোথাও কোন জন্ম নেই, শুধু বেঁচে থাকছে
পুরনো মানুষেরা।"[২৬]

এখানে 'পুরনো মানুষ' বলতে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনহীন, জীবনবিমুখ, মানসিকভাবে মরিচা ধরা মানুষদের বোঝানো হয়েছে—যারা সমাজকে ক্রমাগত পিছিয়ে দেয়। কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা 'কৃষি জমিন' কবিতায় চিরশ্রী দেবনাথ রূপকথার আলোকে কৃষিজীবী, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি গভীর সম্মান প্রকাশ করেছেন। আধুনিক সমাজের মূল চালিকাশক্তি এরা—কিন্তু আলোচিত হয় খুব কমই। কবি তাদেরই জীবনের গল্পকে কল্পলোকের আলোয় আলোকিত করে তুলেছেন।এই কবিতায় শ্রমের সৌন্দর্য, মাটির গন্ধ এবং কৃষকের মমত্ববোধ—সবই মিশে আছে। আধুনিক সময়ের বিবর্ণতায় এই কবিতা একধরনের নির্মলতা এনে দেয়।

বহুমাত্রিকতা ও মানবিক সংবেদন চিরশ্রী দেবনাথের কবিতা— সমাজসচেতন, মানবিক, রূপকে সমৃদ্ধ, এবং অস্তিত্ববোধের গভীরে প্রোথিত।

তার কবিতায় উঠে আসে— নগরায়ণের হিংস্রতা সমাজের স্থবিরতা ,মধ্যবিত্তের বেদনা,শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা, ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা ও সংগ্রাম এবং মনোজগতের সুপ্ত অভিলাষ 'বিশ্বাসের কাছে নতজানু' তাই শুধু একটি কাব্যগ্রন্থ নয়; এটি একজন সংবেদনশীল কবির চোখে দেখা এই সময়ের সামাজিক ইতিহাস।

উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বহুমুখী প্রতিভা নিবারণ নাথ মূলত কবি, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক। তাঁর সৃষ্টিশীলতা যেমন বহুমাত্রিক, তেমনি গভীর সামাজিক চেতনায় দীপ্ত। প্রায় পঞ্চাশটিরও অধিক একাঙ্ক নাটক, বহু প্রবন্ধ এবং গীতি কবিতার পাশাপাশি 'দাগ' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ, যা তাঁর কবিত্বের মেরুদণ্ড ও সত্তার অন্যতম পরিচায়ক।

প্রতিবাদের দাহ ও মানবিক আবেদন গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'দাগ'—যা গ্রন্থের নাম অনুসারে রচিত—নিবারণ নাথের প্রতিবাদী মননকে প্রথমেই উদ্ঘাটন করে। আজকের সমাজে মেরুদণ্ডহীনতার যে করুণ বাস্তবতা, তা কবি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ভাষায় উন্মোচন করেছেন। মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখ খুলতে ভয় পায়—কিন্তু প্রতিবাদ স্তব্ধ হলে সমাজ মৃত হয়ে পড়ে। সেই কথাই কবি বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন—

"আজন্ম আগুন ক'জনইবা ধরে রাখে,
যারা ধরে রাখে
সারা শরীরে ছড়ায়—
তারা অবাঞ্ছিত আগুনে পোড়ে না।"[২৭]

এই পঙ্‌ক্তিগুলিতে আগুন প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতিরোধ, সাহস এবং মানবিক সত্তার স্থায়িত্বের। যারা দগ্ধ হতে জানে, তারাই অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলো জ্বালাতে পারে— এ হল কবির দৃঢ় বিশ্বাস। 'সমাজসেবার মুখোশধারীদের নগ্ন প্রতিচ্ছবি গ্রন্থের আরেক শক্তিশালী কবিতা 'ফলন'—যেখানে কবি ক্ষমতাপ্রবণ ও পুঁজিবাদী সমাজসেবকদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। সমাজসেবার নামে যারা নিজেদের আখের গোছায়, যারা সুবিধাবঞ্চিত মানুষের দুঃখকে পুঁজি করে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করে—কবি তাদের আসল চরিত্র দেখিয়েছেন উপমা ও রূপকের মাধ্যমে।

"ঘাড়ে হাওয়া আছড়ে পড়তেই
পাখিরা উড়ে, হাসে—
পাখিদের সুখ দুঃখ হেন
কেবল কৃষকের ফলন খায়।"[২৮]

এখানে পাখি প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই সব মানুষদের, যারা অন্যের শ্রম, দুঃখ, দারিদ্র্যকে পদানত করে নিজের উন্নতিতে ব্যস্ত। কিন্তু কৃষক— যিনি প্রকৃত সমাজ নির্মাতা—তিনি প্রতারিত, শোষিত, অবহেলিত। এই উপমা নিবারণ নাথের সমাজদৃষ্টি ও বাস্তববোধকে তীব্রভাবে ফুটিয়ে তোলে। কবির সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিবারণ নাথের কবিতা মূলত— প্রতিবাদী, সারল্যনিষ্ঠ, রূপকভরা,সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সরব, এবং গণমানুষের পক্ষে শক্ত অবস্থানকারী। 'দাগ' কাব্যগ্রন্থে তিনি সমাজ, রাজনীতি, শোষণ, নৈতিক ভাঙন ও মানবিক বিপর্যয়কে অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষা সরল, কিন্তু ব্যঞ্জনা গভীর; আবেগ তীব্র কিন্তু সংযত।

উত্তর ত্রিপুরার সমকালীন বাংলা কবিতার পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই অঞ্চলের কবিরা কেবল আঞ্চলিক অভিজ্ঞতার সীমায় আবদ্ধ নন; বরং তাঁদের কবিতা সময়, সমাজ, রাজনীতি, জীবন, মৃত্যু, নাগরিকতা, স্বাধীনতা ও মানবতার গভীর সঙ্কটকে ধারণ করে বৃহত্তর বাংলা কবিতার পরিসরে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে।

সেলিম মুস্তাফার দার্শনিক মৃত্যু-চেতনা, তমাল শেখর দে'র প্রতিবাদী উচ্চারণ, লিটন শব্দকরের দারিদ্র্য-নগরজীবনের বাস্তবতা, অভিজিৎ চক্রবর্তীর রূপকধর্মী কাক-চেতনা, পীযুষ রাউতের শব্দ-নিরীক্ষা— সব মিলিয়ে উত্তর ত্রিপুরার কবিতার পরিমণ্ডল বহুরঙা ও বহুরৈখিক।

অপরদিকে চিরশ্রী দেবনাথ ও নতুন প্রজন্মের কবিদের কবিতায় সমাজ-নিরীক্ষা, পরিচয়বোধ, পরিবেশ-সংকট, পুঁজিবাদী আগ্রাসন এবং ব্যক্তিমানসের ভাঙন নতুন ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে।

ফলে বলা যায়— প্রতিবাদ, মানবিকতা, চেতনা, নন্দনশাস্ত্র ও ভাষার অভিনব নির্মাণ—এই পাঁচ স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে উত্তর ত্রিপুরার সমকালীন বাংলা কবিতা আজ নিজস্ব পরিচয়ে সমৃদ্ধ ও অনন্য।

এই ধারা আগামী দিনে আরও প্রসারিত হবে—কারণ এখানে কবিরা কেবল শব্দের কারিগর নন, তাঁরা সমাজের নীরব ইতিহাস-লেখকও।

তথ্যসূত্র:

১) মুস্তাফা, সেলিম। বারবার পাল্টে যা 'নদীর মতো' (কবিতা)। সৈকত প্রকাশন। প্রকাশকাল-মার্চ, ২০২৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২২।

২) তদেব, 'কোরোনার দিন-১' (কবিতা); পৃষ্ঠা সংখ্যা-২২।

৩)তদেব , 'অন্যকথা ভাবি' (কবিতা), পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৩।

৪) তদেব, 'অন্যলোক' (কবিতা); পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৪।

৫) তদেব, 'কোরোনার দিন -৮' (কবিতা); , পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৯।

৬) শব্দকর লিটন, 'কথা ঘর','মঞ্চের বাষ্প', (কবিতা); ত্রিধারা প্রকাশন, প্রকাশকাল-২০২৩।

৭) তদেব, 'মঞ্চের বাষ্প', (কবিতা); পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬।

৮) তদেব, 'মঞ্চের বাষ্প', (কবিতা); পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬।

৯) তদেব,, 'কুয়াশারা' (কবিতা); , পৃষ্ঠা সংখ্যা -১৩।

১০) তদেব,, 'কুয়াশারা' (কবিতা); পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৩।

১১) তদেব,, 'বানান' (কবিতা) পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১।

১২) তদেব,, 'বানান' (কবিতা) পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১।

১৩) তদেব,, 'বানান' (কবিতা) পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১।

১৪) সন্তোষ রায়,কবিতা সমগ্র 'সংসার' (কবিতা); নীহারিকা প্রকাশন, প্রকাশকাল-ফেব্রুয়ারি ২০২১, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩১৮।

১৫) রায় সন্তোষ, 'সংসার' (কবিতা); নীহারিকা প্রকাশন, প্রকাশকাল-ফেব্রুয়ারি ২০২১, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩১৮।

১৬) রাউত পীযূষ,নির্বাচিত কবিতা' 'মধ্যরাত্রির ব্যান্ডবাদক' (নির্বাচিত কবিতা); স্রোত প্রকাশনা, প্রকাশকাল-জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১২।

১৭) তদেব 'তাঁর সম্পর্কে' (কবিতা); পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২১।

১৮) দে তমাল শেখর,আই কান্ট ব্রিদ', 'আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না' (কবিতা); নীহারিকা প্রকাশন, প্রকাশকাল-২০২৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭।

১৯) তদেব , 'আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না' (কবিতা); পৃষ্ঠার সংখ্যা-৭ উদ্ধৃতি।

২০) তদেব'আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না' (কবিতা); পৃষ্ঠার সংখ্যা-৮ উদ্ধৃতি।

২১) চক্রবর্তী, অভিজিৎ। 'কাক জন্ম' কাক জন্ম' (কবিতা;) সাতদিন প্রকাশক, প্রকাশকাল-২০২১।

৩৩) তদেব, 'কাক জন্ম' (কবিতা); সাতদিন প্রকাশক, প্রকাশকাল-২০২১, পৃষ্ঠা -৪।

২৪) তদেব, কাক জন্ম' পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪।

২৫) নাথ নিবারণ,দাগ' 'দাগ' (কবিতা;) তিনকাল প্রকাশনা, প্রকাশকাল-২০২৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৯।

২৬) তদেব, 'ফলন' (কবিতা)। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০।

২৭) দেবনাথ চিরশ্রী,বিশ্বাসের কাছে নতজানু প্রিয় দোয়েল পাখি' (কবিতা); বর্ণনা প্রকাশনী, প্রকাশকাল-২০২০, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১।

২৮) তদেব 'যৌনতা নয়' (কবিতা)। পৃষ্ঠা সংখ্যা-২।